# নমো চণ্ডী

## অজয়কুমার ভট্টাচার্য

শ্রীশ্রীচণ্ডীর ধ্যানমন্ত্রের প্রথম অংশ দেবীর রূপবর্ণনায় নিয়োজিত এবং শেষ দুটি পঙ্‌ক্তিতে সে-রূপধারণের উদ্দেশ্য বর্ণিত।

''পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ বরঞ্চাভয়কং ক্রমাৎ॥
দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরাম্নায়মানিতাম্।''

—তাঁর এক হাতে পুস্তক, অন্য হাতে রুদ্রাক্ষমালা। এছাড়া আরও দুটি হাতে তিনি বর ও অভয় মুদ্রা ধারণ করে আছেন। এই আগম বা তন্ত্রপ্রতিপাদ্যা দেবীকে নিত্য স্মরণ করতে বলেছেন এই ধ্যানমন্ত্র। চণ্ড শব্দের অভিধানগত অর্থ অতীব উগ্র বা কোপনস্বভাববিশিষ্ট, তাই এই বিশিষ্ট শক্তি যাঁর মধ্যে প্রকাশিত তিনি চণ্ডী। আবার চণ্ড শব্দের অর্থ দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম এবং তাঁর শক্তি হচ্ছেন চণ্ডী। তবে চণ্ডী শব্দের দ্বারা দেবীর বিনাশকারী শক্তির কথাই আমাদের স্মরণে আসে। কিন্তু বিনাশকারীই যদি হবেন, তাহলে হাতে পুস্তক ও রুদ্রাক্ষমালা কেন? ব্রহ্মশক্তি যিনি সৃজন, পালন ও বিনাশচক্রের প্রবর্তন করেছেন, তিনিই আবার এই চক্রব্যূহের বাইরে যাওয়ার পথ দেখান। ওই পুস্তক ও রুদ্রাক্ষমালা বিদ্যা ও বৈরাগ্যের প্রতীক, যা আশ্রয় করে তাঁরই সৃষ্ট জগতসম্মোহনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এ-সংসারের অবিদ্যামায়াকে পরিহার করে বিদ্যামায়াকে আশ্রয় করা, স্থূল-সূক্ষ্ম সমস্ত রকম ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বিরাগ, এবং বিদ্যা ও অবিদ্যামায়ার অতীত সেই মাতৃশক্তিতে অনুরাগ, এগুলিই এ-চক্রব্যূহ থেকে বেরোনোর পথ। একথাই যেন তাঁর রূপে বিধৃত।

গীতা যেমন মহাভারতের ভীষ্মপর্বের আঠারোটি অধ্যায়ের সংকলন, তেমনই চণ্ডী মার্কণ্ডেয়পুরাণের তেরোটি অধ্যায়ের সংকলন। গীতায় সেই মায়াতীত তত্ত্বের প্রতিপাদন আর চণ্ডীতে প্রতিপাদিত সেই মহামায়ারই স্বরূপ যা তন্ত্রশাস্ত্রের সার। চণ্ডীপাঠের ক্রম যেন তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব এই তিনগুণ অতিক্রমণের পথ—যা সেই গুণময়ী অথচ গুণাতীত মহামায়াতে পর্যবসিত। চণ্ডীর প্রথম চরিত্র মহাকালী তমোগুণের প্রতীক, মধ্যম চরিত্র রক্তবর্ণা মহালক্ষ্মী রজোগুণের প্রতীক এবং উত্তর চরিত্র শুভ্রবর্ণা মহাসরস্বতী সত্ত্বগুণের প্রতীক। এই তিনটি চরিত্র পাঠের পর দেবীসূক্তের বর্ণনা আছে। এই ত্রিগুণময়ী মহামায়া প্রসন্ন হয়ে দ্বার উন্মুক্ত করলে গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছে দেবীসূক্তে বর্ণিত বাক্ ঋষির মতন বলতে পারা যায়—আমিই রুদ্র, অষ্টবসু, আমিই জগৎ ও জগৎ-কারণ।

এই মহামায়ার স্বরূপ বোঝাতে পুরাণ একটি সুন্দর গল্প উপস্থাপিত করেছেন। সুরথ নামে একজন বিশাল সাম্রাজ্যের প্রজাবৎসল রাজা শত্রু

দ্বারা আক্রান্ত হলেন। ঘোরতর যুদ্ধে সাম্রাজ্যের অধিকাংশ হারিয়ে রাজধানীতে ফিরে দেখলেন তাঁর পরাজয়ের দুর্বলতার সুযোগে তাঁরই অমাত্যেরা সর্বস্ব দখল করেছে। ক্ষমতাচ্যুত রাজা মৃগয়ার অছিলায় একা ঘোড়ায় চেপে এক গহন বনে চলে গেলেন। সেই শ্বাপদসংকুল অরণ্যে মেধা ঋষির তপোবনসুলভ এক আশ্রম ছিল। ঋষির অনুমতিক্রমে রাজা সেখানে থাকতে মনস্থ করলেন। কিন্তু মন তাঁর কেবল রাজ্যের শুভাশুভ খবরের জন্য উন্মুখ হয়ে রইল। দুর্ভাবনায় ভাবিত রাজা ঘুরতে ঘুরতে অত্যন্ত বিমর্ষ ও ক্লিষ্টমুখে আসীন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তাঁর পরিচয় ও বিমর্ষতার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, ''আমার নাম সমাধি, ধনী বৈশ্যকুলে আমার জন্ম কিন্তু সম্প্রতি আমার স্ত্রী-পুত্রেরা ধনলোভে আমাকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করেছে। আমি তাদের কুশল সংবাদ না পেয়ে পীড়িত ও বিমর্ষ হয়ে আছি।'' রাজা বললেন, ''তারা আপনার সঙ্গে যে-ব্যবহার করেছে, তারপরেও তাদের জন্যে আপনার মন এত উতলা কেন?'' সমাধি বললেন, ''আমি জানি আমার পত্নীপ্রেম বা পিতৃস্নেহে তাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই, তবু আমার মন কিছুতেই তাদের প্রতি নিষ্ঠুর হচ্ছে না, এ এক অদ্ভুত ব্যাপার।''

সাধারণের মনে এটি নিতান্ত স্বাভাবিক, এমনকী মহত্ত্বের পরিচায়ক বলে গৃহীত। কিন্তু সমাধির বিচারশীল মনে এক জিজ্ঞাসার উদয় হল, যে-জিজ্ঞাসা চিরকাল জাগতিক এবং পরাজাগতিক উভয় বিষয়ের জ্ঞানের পথই উন্মুক্ত করেছে। আপেল তো চিরকালই গাছের তলায় পড়ে। সাধারণ মনে তা কোনও প্রশ্নচিহ্ন আঁকে না; কিন্তু নিউটনের মনে এঁকেছিল, আর জগদ্‌বাসী পেয়েছিল মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব। সমাধির মনের এই জিজ্ঞাসা তাঁকে মেধা ঋষির কাছে উপস্থিত করল। তাঁকে জানতে হবে এই যুক্তিহীন মানসিক প্রবণতার কারণ কী? তাঁর প্রশ্নের উত্তরে মেধা ঋষি তাঁদের কাছে মহামায়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন যা চণ্ডীরূপে জগতের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মহামায়ার উদ্বোধনও হয়েছে একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে। অনন্তশায়ী বিষ্ণু কারণসমুদ্রে যোগনিদ্রায় মগ্ন। তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্ম উত্থিত হল যাতে অযোনিসম্ভব ব্রহ্মা সৃষ্ট হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, সংসারী মানুষের মন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভিতে আবদ্ধ থাকে। ব্রহ্মার সৃষ্ট জগৎসংসার ও তার সমষ্টিমন যাতে এ-তিনভূমিতেই আবদ্ধ থাকে, হয়তো সেইজন্যেই তাঁর উৎপত্তি হল বিষ্ণুর নাভিপদ্মে।

এদিকে বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে উদ্ভূত হল মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুর। তাদের উৎপত্তি নাভির অনেক ওপরে প্রায় আজ্ঞাচক্রে। প্রথমেই তারা ব্রহ্মাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। তখন ব্রহ্মা ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন যাতে বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং তিনি ব্রহ্মাকে রক্ষা করেন। বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ হল, তিনি দেখলেন ব্রহ্মা বিপন্ন; যেহেতু তাঁরই সৃজনেচ্ছায় ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছে তাই তিনি ওই অসুরদ্বয়ের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। চণ্ডীতে বলা হয়েছে বিষ্ণু পাঁচহাজার বছর ধরে তাদের সঙ্গে বাহুযুদ্ধ করেও তাদের বধ করতে পারলেন না। তখন তাঁর মায়াশক্তিকে তাদের ওপর প্রয়োগ করে তাদের বিমোহিত করলেন। মোহগ্রস্ত হয়ে তাদের অহংকারবোধ তীব্র হল এবং বলের অহংকারে স্ফীত হয়ে তারা বিষ্ণুকেই তাদের কাছে বর প্রার্থনা করতে বলল। বিষ্ণু চাইলেন একটিই বর : ''তোমরা আমার বধ্য হও।'' তারা সম্মত হলে তিনি তাদের বধ করলেন।

ব্রহ্মা নির্বিঘ্ন হলেন ও তাঁর সৃষ্ট জগৎসংসার সেই উদ্বোধিত মায়াশক্তির দ্বারা সম্মোহিত হল। জীবের তীব্র অহংকারবোধ স্রষ্টাকে অস্বীকার করিয়ে তাকে জাগতিক বিষয়ে ব্যাপৃত রাখল এবং

চক্রবৎ জন্ম থেকে জন্মান্তরে পরিভ্রমণ করাতে লাগল।

চণ্ডীর আখ্যানভাগের মধ্যেই মহামায়ার স্বরূপ বর্ণিত। অসুরদের কাছে পরাজিত হয়ে দেবতারা বিষ্ণুর শরণ নিচ্ছেন এবং মায়াশক্তি বিষ্ণুর কৃপায় রূপপরিগ্রহ করে অসুরনিধন করছেন। এই আখ্যানগুলিকে ভাবগতভাবে দেখলে আমাদের যুক্তিবুদ্ধির মাধ্যমে গ্রহণ করতে সুবিধা হয়। দেবতারা মানব অপেক্ষা অধিক শক্তি ও গুণসম্পন্ন হলেও তাঁরা তাঁদের পুণ্যকর্মের ফলভোগী মাত্র এবং সে-ভোগের মাত্রাও মানব অপেক্ষা অনেক গুণ বেশি। কিন্তু ভোগের অব্যবহিত ফল অন্তরে আসুরীবৃত্তির বৃদ্ধি এবং অপরিমিত ভোগের ফল সেই আসুরীবৃত্তির কাছে নিজের দেবভাবের পরাজয়। যে-গুণে তাঁরা দেবতা, সেই দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব লোপ পেয়ে কেবল আসুরীবৃত্তির অসুরই বিরাজ করতে থাকে। কিন্তু তাঁরা দেবতা বলেই নিজেদের পতন ও পতনের কারণ ধরতে পারেন এবং দেবগুণ ফিরে পেতে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। তখন মহামায়াকে স্তবস্তুতি করে বিষ্ণুর সহায়তায় নিজেদের অন্তরে আসুরীবৃত্তি নিধন করে দেবভাব ফিরে পান।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর আখ্যানভাগ থেকে সাতটি শ্লোক (১।৫৫, ৪।১৭, ১১।১০, ১১।১২, ১১।২৪, ১১।২৯ এবং ১১।৩৯) চয়ন করে তাকে সপ্তশ্লোকী চণ্ডী আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। কারণ এই সাতটি শ্লোকের মর্মার্থ অবগত হলেই চণ্ডীর প্রতিপাদ্য মহামায়ার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়।

''জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥''

মহামায়ার আবরণশক্তির তীব্রতার পরিচয় দিতে গিয়ে ঋষি বলেছেন, যাঁরা জ্ঞানী অর্থাৎ যাঁদের নিত্যানিত্য বিবেক বর্তমান, যাঁরা মায়াশক্তির প্রভাব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁদেরও মহামায়া বলপূর্বক আকর্ষণ করে মোহগর্তে নিক্ষেপ করেন। স্বামীজী বলেছেন মায়া কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা কুহক বা ইন্দ্রজালজাতীয় কিছু নয়। আমরা যেভাবে এ-জগৎ দেখি সেটিই মায়া : ''এই সংসারগতি বর্ণনার নামই মায়া।'' বলেছেন, ''জননী সন্তানকে সযত্নে লালন করিতেছেন। তাঁহার সমস্ত মন, সমস্ত জীবন ওই সন্তানের প্রতি রহিয়াছে। বালক বর্ধিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইল এবং হয়তো কুচরিত্র ও পশুবৎ হইয়া মাতাকে পদাঘাত ও তাড়না করিতে লাগিল। জননী তথাপি পুত্রে আকৃষ্ট...। তিনি যতই চেষ্টা করুন না, এ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। ইহাই মায়া।... কোনও সময়ে রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়—'এই পৃথিবীতে অত্যন্ত আশ্চর্য কী?' রাজা উত্তর করিয়াছিলেন, 'লোকসকল প্রত্যহই চতুর্দিকে মরিতেছে কিন্তু জীবিতেরা মনে করে তাহারা কখনই মরিবে না। ইহাই মায়া।' '' এর নাম তাই অঘটনঘটনপটিয়সী। যুক্তি-বুদ্ধি-বিচারের দ্বারা কোনও বিষয়কে সত্য বলে বুঝতে পারলেও এই মায়াশক্তির বলে তা ধারণা হয় না। আমরা মুখে বলি—আমার দেহ, আমার মন—কিন্তু আমাদের ধারণায় আমিই দেহ, আমিই মন। তাই মনের দুঃখে কাঁদি, দেহসুখে সুখী হই।

''দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥''

—সংকটে মহামায়াকে স্মরণ করলে জীবের সকল ভীতি নাশ হয় আর বিবেকী ব্যক্তি তাঁকে স্মরণ করলে অতীব সৎ ও শুভবুদ্ধি তিনি দান করেন। কারণ দারিদ্র্য, দুঃখ ও ভয়হারিণী তাঁর মতন আর কে আছে, যিনি সর্বদাই আমাদের কল্যাণের জন্য করুণাসিক্ত হৃদয়ে অপেক্ষা করে আছেন?

আমরা মহামায়ার মোহিনী শক্তির কবলে পড়ে মোহগ্রস্ত হই, যদিও আমরা যে মোহগ্রস্ত সে-বোধই

আমাদের থাকে না, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় যাঁর সে-বোধ হয়েছে এবং বৈশ্য সমাধির মতো যিনি নতজানু হন তিনি সেই মায়াশক্তিরই শরণ নেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ''যাঁর মায়া তিনিই মুক্তি দিতে পারেন, মানুষের কি সাধ্য আছে।'' তাঁকে সংকটে স্মরণ করা তাঁর শরণ নেওয়ারই প্রাথমিক পর্যায়। বৈশ্য সমাধির সংকট তাঁর ধনসম্পদ হারানো ও আত্মজের দ্বারা বিতাড়িত হওয়া নয়; বরং তা তাঁকে পরম জিজ্ঞাসার মুখোমুখি করেছে। তাঁর সংকট তাঁর মনের ওপর নিয়ন্ত্রণহীনতা যা তাঁকে জোর করে অপাত্রে স্নেহপ্রদর্শনে বাধ্য করছে। আর ভয় এই নিয়ন্ত্রণহীনতার ফলে মনের ক্রীড়নক হয়ে জীবিত থাকা—'বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি'—জলে বায়ুতাড়িত নৌকার মতন। আমাদের আর্থিক দারিদ্র্য অপেক্ষা গুরুতর আমাদের এই মোহমুক্তির চেষ্টার অভাব ও সে-বিষয়ে ভাবনার দারিদ্র্য। তিনিই আশ্রয়দাতা জেনেও তাঁতে শরণ না নিতে পারার দুঃখ। এই সংকট, এই ভয়, দুঃখ, দারিদ্র্য—তার সামগ্রিকতার বোধে যিনি তাঁকে স্মরণ করবেন তাঁর সমস্ত ভীতি তো তিনি হরণ করবেনই, উপরন্তু তাঁকে শুভবুদ্ধি দিয়ে মোক্ষপথে চালিত করবেন, কারণ তিনি শরণাগতদের জন্য করুণার্দ্র হৃদয়ে সর্বদা অপেক্ষমান। লাটু মহারাজ এ-বিষয়ে একটি দোঁহা বলতেন, ''যো যাকো শরণ লে, সো তাকো রাখে লাজ/উলট জলে মছলি চলে বহি যায় গজরাজ।'' বিপরীত স্রোতে মাছ নির্বিঘ্নে এগিয়ে যায় কারণ মাছ জলকেই আশ্রয় করেছে, কিন্তু প্রবল পরাক্রমী হাতি খড়কুটোর মতন ভেসে যায়।

''সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥''

—সকল মঙ্গলের মঙ্গলরূপিণী, সর্বাভীষ্টদায়িনী, মঙ্গলকারিণী, একমাত্র শরণযোগ্যা, ত্রিভুবনের জননী, গৌরবর্ণা মা তুমি, তোমাকে প্রণাম। বলা হল তিনি মঙ্গলস্বরূপিণী তাই সর্বদা মঙ্গলময়ী। এখন প্রশ্ন ওঠে তিনি যদি সর্বদা মঙ্গলকারিণীই তাহলে জগতে এত অমঙ্গল কেন? এর উত্তর খুঁজতে আমাদের মঙ্গল-অমঙ্গলের ধারণাটি একবার বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

জাগতিক বিষয়ে আমাদের ইচ্ছাপূরণের ব্যাঘাতই আমাদের কাছে অমঙ্গল বলে চিহ্নিত। আমরা চাই চিরস্থায়ী জীবন, সম্পদ, নাম, যশ, সুখভোগ ইত্যাদি, যা ব্যাহত হলেই আমাদের কাছে মহা অমঙ্গল। কিন্তু জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, তাই সৃষ্টিকে নিলে বিনাশকেও নিতে হবে কারণ তা অবশ্যম্ভাবী। আমাদের কাছে এই জাগতিক অনিত্যতাই সর্ব অমঙ্গলের কারণ। এ-বিষয়ে পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজীর বলা একটি গল্প স্মরণ করা যেতে পারে। এক ব্রাহ্মণ তাঁর দারিদ্র্য, স্ত্রীর দীর্ঘস্থায়ী রোগ, আত্মীয়স্বজনের শত্রুতা ইত্যাদি সাংসারিক অমঙ্গলে জেরবার। নৈরাশ্যের জ্বালায় তিনি আত্মহননের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সে-উদ্দেশ্যে বেরিয়েও পড়লেন। পথে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা, যিনি তাঁর নৈরাশ্যে ভরা বিমর্ষ মুখখানি দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণ তাঁকে সব বললে তিনি বললেন, ''আত্মহত্যা করবে কেন? এ-জগৎ পরিবর্তনশীল, এ-অবস্থা, এ-দিন চিরকাল থাকবে না, বাড়ি ফিরে যাও।'' সন্ন্যাসীর কথার তেজ তাঁর মনে বিশ্বাস এনে দিল এবং ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরে গেলেন। সত্যই কিছুদিন পরে তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘুরল। স্ত্রী সুস্থ হলেন, দারিদ্র্য ঘুচল। ব্রাহ্মণ তখন ভাবলেন, ভাগ্যে সেই সন্ন্যাসীর দেখা পেয়েছিলেন, তাই আত্মহত্যা করেননি। কিন্তু মনে পড়ল তিনি কী বলেছিলেন, এ-অবস্থা, এ-দিন চিরকাল থাকবে না। ব্রাহ্মণের চমক ভাঙল, মনে হল, তাই তো, এখনকার সুখের দিনও তো চিরকাল থাকবে না! এই ভাবনায় তাঁর বিবেক জাগ্রত হল। তখন তিনি নিত্যসুখের, নিত্যমঙ্গলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। প্রাথমিক অমঙ্গলই সেই ব্রাহ্মণের

সামনে ক্রমে নিত্যমঙ্গলের পথ উন্মুক্ত করে দিল। তাই ভক্ত প্রার্থনা করে : ''যদি কোন দিন তোমার আহ্বানে/ সুপ্তি আমার চেতনা না মানে/ বজ্রবেদনে জাগায়ো আমারে/ ফিরিয়া যেও না প্রভু।'' মা মহামায়া ফিরে যান না, কাউকে ফেরানও না। ভক্ত-অভক্ত-নির্বিশেষে নানাভাবে এমনকী জাগতিক অমঙ্গলের মধ্য দিয়েও আমাদের চেতনা সম্পাদন করার চেষ্টা করেন, যাতে আমরা নিত্যমঙ্গলের রাজ্যে উপনীত হই। তাই তিনি স্বরূপত মঙ্গলবিধায়িনী। আমাদের গমনাগমনের তিন ভুবনেরই অধিষ্ঠাত্রী জননী তিনি। তাঁর শুভ্রতা দিয়ে আমাদের কালিমা অপনোদন করেন, তাই তিনিই একমাত্র শরণযোগ্যা।

''শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥''

—যিনি সকলের আর্তিহারিণী এবং শরণাগত, দীন ও আর্তের পরিত্রাণ-পরায়ণা, সেই দেবীকে প্রণাম করি। তিনি সর্বাভীষ্টদায়িনী। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের মধ্যে যে যা চায় দেবী তাকে তাই দিয়ে থাকেন। দীনতা মানুষের এক দুর্লভ গুণ, কারণ নিজের অকিঞ্চিৎকরতা ও সীমাবদ্ধতার ধারণা না এলে মানুষের মনে দীনভাব আসে না। এই ভাব এলে তবেই তার বন্ধনের হাত থেকে মুক্তির আর্তি জাগে। তখন সে মহামায়ার শরণ গ্রহণ করে, আর দেবীও শরণাগতকে ত্রাণ করেন।

''সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥''

—তিনি জগতের সকল বিষয়, বস্তু ও জীবের সত্তাস্বরূপ অর্থাৎ তাঁর সত্তায় সব সত্তাবান, তাই তিনি সকলের ঈশ্বরী, নিয়ন্ত্রীস্বরূপ এবং প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সমস্ত শক্তির উৎস। তাই আমরা তাঁর কাছে সকল ভয়ের হাত থেকে ত্রাণ প্রার্থনা করি। সেই দেবীকে আমাদের প্রণাম। এ-জগৎ তাঁরই সৃষ্ট—তাই তিনি এর প্রতিটি বস্তু, বিষয় বা জীবের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছেন। মাকড়সা যেমন নিজের দেহ থেকে সুতো বার করে জাল বোনে ও তাতেই অধিষ্ঠান করে, তেমনই তাঁর সৃষ্ট জগতে তিনি শুধু অধিষ্ঠিত নন, তার নিয়ন্ত্রণও তাঁর হাতে এবং সমস্ত শক্তির উৎস তিনিই। অতএব তাঁর জগতে তাঁরই সৃষ্ট সকল রকম ভয়ের হাত থেকে রক্ষাকারিণী যে তিনিই, তাতে সন্দেহ নেই। জগতের সমস্ত ভয়ই হারানোর বা বিনাশের আশঙ্কা থেকে উদ্ভূত, তাই শাস্ত্রে বৈরাগ্যকেই একমাত্র অভয় বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমাদের ভয় পদে পদে। সংসারে সম্মুখস্থ ভয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা প্রার্থনা করি এবং আমাদের আন্তরিকতা ও বিশ্বাস অনুযায়ী পরিত্রাণও পাই। কিন্তু আমাদের আত্যন্তিক ভয়ের নিবৃত্তি হয় না। বিচারশীল বিবেকবান কেউ কেউ তাঁদের ক্ষুদ্র আমিত্বের বন্ধন ও সেই বন্ধনজনিত ভয়ের হাত থেকে চিরতরে মুক্তির আর্তি জানান। দেবী মহামায়া তাঁদের বৈরাগ্যস্বরূপ অভয় প্রদান করেন এবং তাঁরা তাঁর শরণ নিয়ে অচিরেই অভীঃ হয়ে ওঠেন।

''রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি॥''

—মহামায়া তুষ্টা হলে সকল রোগের বিনাশ করেন আবার রুষ্টা হলে সমস্ত কাম্য অভীষ্টের বিনাশ করেন। তাঁকে আশ্রয় করলে মানুষের বিপদ স্থায়ী হয় না, আবার তাঁর আশ্রিত যিনি তিনি অপরের আশ্রয়দানের যোগ্য হয়ে ওঠেন।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেবী মহামায়া তুষ্টা বা রুষ্টা হলে কী হয় তা বলা হয়েছে। তবে আমরা যাঁর সত্তায় সত্তাবান তিনি রুষ্ট বা তুষ্ট যাই হোন না কেন, তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই। যেমন মা প্রয়োজনে রুষ্টা হয়ে সন্তানের শাস্তিবিধান করেন কিন্তু সে-শাস্তি সন্তানের মঙ্গলের জন্যই। তেমনই

দেবী, কাম্যবস্তুর লোভে বিপথে চালিত মানুষের বিষয়গুলি তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তাকে সুপথে চলার সুযোগ করে দেন। আর যাদের প্রতি তিনি তুষ্ট তাদের ভবরোগ বিনাশ করেন। দেবীর এই সন্তোষ ও রোষের লীলা যিনি বুঝতে পারেন তিনি তাঁকেই আশ্রয় করেন এবং দেবীর কৃপায় সেই আশ্রিত ব্যক্তি সমস্ত বিপদ ও ভয়ের হাত থেকে মুক্ত হয়ে যান। শুধু তাই নয়, তিনি অপর আর্ত ব্যক্তির আশ্রয়স্বরূপ হয়ে ওঠেন। এঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, ''স্টীমবোট (কলের জাহাজ)—আপনিও পার হয়ে যায় এবং অপরকে পার করে নিয়ে যায়।''

''সর্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্॥''

—হে অখিল ভুবনের ঈশ্বরী, আমাদের সকল বিঘ্ন ও সকল শত্রু এখন যেমন বিনাশ করলেন, সেরকম ভবিষ্যতেও করবেন।

এতক্ষণ দেবীর সম্মোহনী শক্তি, তার থেকে মুক্তির উপায়, তাঁর শরণগ্রহণ এবং শরণাগতের প্রতি তাঁর করুণা ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। এই শ্লোকে যেন তাঁর শরণাগতের তাঁর ওপর জোর খাটানোর প্রয়াস লক্ষিত হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ একে বলতেন ভক্তির তমঃ। তুমি যখন আমার পিতামাতা, আমার সর্বস্ব তখন আমাকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য অর্থাৎ 'এবমেব' এইভাবেই তোমাকে করে যেতে হবে। শ্রীমা তাঁর সন্তানদের বলতেন, ''সব সময় ভাববে তোমার একজন মা আছেন'' অর্থাৎ তিনি সর্বদা তোমাকে দেখছেন। এটিই শরণাগতের নিশ্চিন্ত নির্ভরতা।

প্রসঙ্গত স্বামী নিরাময়ানন্দজীর বলা একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তখন উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদক। সে-মাসে সম্পাদকীয়ের বিষয় স্থির করে উঠতে পারছেন না। ভাবছেন, এমন সময় দেখলেন সামনের বস্তির একটি ছেলে খেলায় মত্ত। তার মা তাকে মাঝে মাঝে ডাকছেন, আর সে 'যাচ্ছি' বলে আবার খেলাতেই মগ্ন হয়ে পড়ছে। খানিকক্ষণ পর সন্ধ্যা নামছে দেখে তার মা জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেলেন। মহারাজ ঘটনাটি দেখে ভাবলেন, আমরাও তো খেলায় মত্ত। মায়ের ডাক শুনেও শুনতে চাই না। কিন্তু তাতেও ক্ষতি নেই যদি অন্তরে মাতৃ-অস্তিত্বের নিশ্চিত ধারণা থাকে, যে-ধারণা শ্রীমা আমাদের রাখতে বলছেন। ছেলেটির মাতৃনির্ভরতা যেমন মাকে এসে তাকে ঘরে নিয়ে যেতে বাধ্য করল, সেইরকম আমাদের শরণাগতির ফলে আমরা বুঝতে পারব, আমরা যাই করি না কেন আমাদের রক্ষা করা মহামায়ার অবশ্য কর্তব্য এবং তিনি তা করবেনই। এই ভাবটি মহারাজের সে-মাসের সম্পাদকীয় লেখার বিষয় হয়ে গেল।

মেধা ঋষি মহামায়ার আখ্যান শেষ করলেন এবং তাঁর উপদেশে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য মহামায়ার কৃপালাভের উদ্দেশ্যে তপস্যা শুরু করলেন। নদীর ধারে মৃণ্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করে দেবীসূক্তের জপ ও অতি কঠোর জীবনযাপন শুরু করলেন। তাঁদের তপস্যায় মহামায়া আবির্ভূতা হলে সমাধি তাঁর অনুভূত মায়ার সম্মোহন থেকে মুক্তি চাইলেন আর রাজা সুরথ তাঁর ভোগবাসনা তৃপ্ত না হওয়ায় এক শত্রুহীন বিশাল রাজ্যের অধিপতি হিসেবে দীর্ঘকাল সুখভোগ কামনা করলেন। সর্বাভীষ্টদায়িনী দেবী সমাধিকে মোক্ষ ও রাজাকে তাঁর বাসনা পূরণের বর দিলেন। তাই দেব, মানব সকলেরই প্রার্থনা—

''দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ।
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং।
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥''

—হে অখিলজগতের জননী, সমগ্র চরাচরের দেবী বিশ্বেশ্বরী, এ-বিশ্বকে রক্ষা করো ও আমাদের প্রতি প্রসন্না হও।